সমকাল

তারিখ 01-4 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ......

সেশনজটে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাঙ্গন | শহিদুল ইসলাম

পরিচালক, বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ
বশেমুরবিপ্রবি, গোপালগঞ্জ

গত ১২ এপ্রিল সমকালের প্রধান খবরের শিরোনাম ছিল 'পাস করতেই পার চাকরির বয়স'। লেখাটির মূল বিষয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়াবহ সেশনজট। অনুসন্ধানমূলক ওই প্রতিবেদনে প্রতিবেদক সেশনজটের ভয়াবহতা মুনশিয়ানার সঙ্গে তুলে এনেছেন। প্রতিবেদনটি পড়ে আমার ইচ্ছে হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তার পরিণাম সম্পর্কে আমি যে দু'চারটি লেখা লিখেছিলাম সেখান থেকে আজ পুনরায় কিছু অংশ তুলে ধরি।

২. আমার সেই পুরনো কথাগুলো তুলে ধরার আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রখ্যাত গবেষক ও শিক্ষক ড. হারুন-অর-রশীদের কথা বলতে হয়। সমকালকে তিনি বলেছেন, 'প্রকট সেশনজট সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল।' তবে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন, 'গতানুগতিক পন্থায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট দূর করা একেবারেই অসম্ভব।' অর্থাৎ বর্তমান কাঠামো বহাল রেখে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটা যে 'একেবারেই অসম্ভব' এ কথাটি আমি ১৯৯৫ সালে ভোরের কাগজে 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক কলামে যুক্তিসহকারে তুলে ধরেছিলাম। তিনি আরও বলেছেন, 'সারাদেশে দুই হাজার কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠান, খাতা মূল্যায়ন, ফল প্রকাশ কোনো ছোট কাজ নয়।' নিশ্চয়ই নয়। সেদিনের সে লেখায় আমিও এ বিষয়ে লিখেছিলাম, 'প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মতো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডেরও ধারণক্ষমতার একটা সর্বোচ্চ সীমা থাকে। সে সীমা অতিক্রান্ত হলে নানা রকম বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা দেখা দেয়।' তখন শ্রেষ্ঠ উপায় হলো বিকেন্দ্রীকরণ। উদাহরণ হিসেবে বোর্ডের কথা উল্লেখ করি। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর দেশের সব স্কুলের দায়িত্ব একমাত্র ঢাকা বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু কালের গতিতে ছাত্র ও স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চাশের দশকের শেষেই স্পষ্ট হয়ে যায় একটি মাত্র বোর্ডের পক্ষে বাংলাদেশের সব স্কুলের দেখভাল করা সম্ভব নয়। তাই ১৯৬২ সালে চারটি বিভাগীয় শহরে আরও চারটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করে অবস্থা সামাল দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে ঠিক বিপরীত কাজটি করা হয় কলেজগুলোর ক্ষেত্রে। বিকেন্দ্রীকরণ না করে ঢাকায় একটি পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক অফিস স্থাপন করে সব কলেজের দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই কলেজগুলোর উচ্চশিক্ষার পাট যে চুকে যাবে, সে কথা নানাভাবে সেদিন উচ্চারণ করেছিলাম। কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের কানে সে সাবধানবাণী সেদিন প্রবেশ করেনি। একটি কেন্দ্রীভূত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে ঢাকায় একটি পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক অফিস খোলাই হলো আজকের সমস্যার মূল কারণ।

৩. সেদিন আমি আরও যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম তার একটি হলো 'কথা নাই, বার্তা নাই, প্রায় ১০০ বছরের পরীক্ষিত একটি শিক্ষা কাঠামো হঠাৎ করে ভেঙে ফেলা হলো কেন? এ সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের গঠনমূলক কোনো ভাবনা-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।' আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুলেছিলাম। সেখানে আজও কলেজগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে কেবল মাস্টার্স পড়ানো হয়। লিখেছিলাম, 'যারা কলেজে পড়ান, তারা কখনও মনে করেন না যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমতুল্য কাজ করছেন না।' পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সংসদের প্রতি বছরের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত গবেষণা প্রবন্ধগুলোর লেখকদের পরিচয় নিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন মফস্বল কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক-গবেষকদের সংখ্যাই বেশি। আরও লিখেছিলাম, 'সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যখন শিক্ষা কাঠামোর আরও বিকেন্দ্রীকরণের দরকার ছিল, তখন ঐরূপ কেন্দ্রীভবন সমস্যাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বৈ কমাবে না।' আমার সেদিনের ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪. প্রায় ১৮০ বছর আগে প্রবর্তিত শিক্ষা কাঠামোটির নাম 'সিঁড়িভাঙা শিক্ষা কাঠামো।' এখানে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় একই ধারাবাহিক শিক্ষা কাঠামোর অংশ। বিচ্ছিন্ন কোনো আলাদা স্তর নয়। এই সিঁড়িভাঙা কাঠামোর একটি সিঁড়িকে যদি ভেঙে ফেলা হয় তাহলে সব শিক্ষা কাঠামোই ধ্বংস হয়ে যাবে। সিঁড়িভাঙা শিক্ষা ব্যবস্থার ধাপগুলো ছিল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিকের এগারো ও বারোতম ক্লাস স্কুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলেজে পাস, সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়। এর অর্থ কলেজের ছাত্রদের কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে ঢোকার কোনো সুযোগ নেই। তাদের সংখ্যা উচ্চশিক্ষার্থীর প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়েও এই ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে পারছে। তারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কখনও পা রাখেনি। এমনকি যেটাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা হচ্ছে; সেটা আদতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা, তাদের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

৫. কলেজের শিক্ষকরাও সেদিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বড় ভাইসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আর্থিক বিষয়টি জড়িত ছিল। কলেজের শিক্ষকরা মূলত ডিগ্রি পাসের পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় দায়িত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু না চাইতেই সম্মান ও মাস্টার্সের দায়িত্বও তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। সে ভার বহন করার জন্য তারা তৈরি ছিলেন না। উপাচার্য প্রফেসর আবদুল বারী সেদিন বলেছিলেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৬(খ) ধারাবলে কলেজের শিক্ষকদের বুনিয়াদি চাকরিকালীন ও গবেষণামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করা হবে। 'কলেজে শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা মুখে বলা বা আইনের বইতে লেখা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ হবে না।' সেদিনের সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে এবং কলেজের উচ্চশিক্ষার মানের ক্রমাবনতি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

৬. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুক্তি হিসেবে সেদিন আর একটি কারণ তুলে ধরা হয়েছিল। তা হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেশনজট'। সেই সেশনজট নিরসনের জন্য নাকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট তার সেদিনের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছে। সেশনজট আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজের প্রায় ৭০ ভাগ শিক্ষার্থীর জীবন থেকে দুই থেকে চারটি মূল্যবান বছর কেড়ে নিয়েছে। 'পাস করতেই তাদের চাকরির বয়স পার' হয়ে যাচ্ছে। এবারে কর্তাব্যক্তিরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনে আর কী ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন?

৭. তাই এ সমস্যা সমাধানে আজ আবার সেই পুরনো প্রস্তাবই পেশ করছি। 'যেসব পুরনো জেলা শহরে আজও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেসব জেলা শহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং ওই পুরনো বৃহত্তর জেলার মধ্যে যতগুলো ডিগ্রি কলেজ আছে, সেগুলোকে ওই জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করতে হবে।' সেদিন সরকার আমার প্রস্তাবের প্রথম অংশটুকু গ্রহণ করেছিল। ১২টি জেলায় ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন বর্তমান সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশটুকু বাস্তবায়িত করা শুরু হোক। বাংলাদেশের সব জেলার ডিগ্রি কলেজগুলোকে জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত পুরনো ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হোক। প্রথমে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য জনবল নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন জনবল নিয়োগ করে সে সমস্যা দূর করা অসম্ভব কিছু নয়। সেই সঙ্গে আর একটি সমস্যার সমাধান কিছুটা সম্ভব হবে। তা হলো প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি। তখন একটি আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন ফাঁস হলে তার প্রভাবটা সারাদেশের ওপর বর্তাবে না। অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা সহজেই নিরাময়যোগ্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে এ সমস্যার কোনো উত্তরণ সম্ভব নয়– উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশীদের সঙ্গে আমি একমত। তবে সেদিনের সে প্রস্তাব সামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে। তা হলো, যেহেতু প্রতিদিন ছাত্র সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই আজকের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৮. উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশীদের একটি বক্তব্যের সঙ্গে আমি ঐকমত্য পোষণ করতে পারি না। তিনি বলেছেন, 'সারাদেশে সবচেয়ে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এটি।' প্রথম আপত্তি 'সরকারি' শব্দটির বিষয়ে। এটি একটি জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। জনগণের অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলো চলে। আর দ্বিতীয় আপত্তি হলো 'এটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়।' বিশ্ববিদ্যালয় নামের যে ভবনের মধ্যে দেশের প্রায় দু'হাজার কলেজের পরীক্ষা গ্রহণ ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম করা হয়, সেটা একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের সমতুল্য। যে ভবনের মধ্যে লেখাপড়া-গবেষণা হয় না, তার নাম আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

৯. সবশেষে দেশ ও মানুষের স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের বড় ভাইসুলভ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে কলেজ-শিক্ষকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা এই মধুর সম্পর্ক যেমন উভয়ের জন্যই ভালো হবে, তেমনি রাষ্ট্র ও মানুষও উপকৃত হবে। কথাটি বলতে গলা কেঁপে উঠল। কারণ ভালোকে কীভাবে খারাপ করা যায়, তা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের মানুষ আমাদের চেয়ে ভালোভাবে করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। ভালোকে খারাপ করতে পৃথিবীতে আমাদের জুড়ি নেই।

১০. আমার এ লেখাটির সারমর্ম হলো সিঁড়িভাঙা শিক্ষা কাঠামোর যে সিঁড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে সেটির পুনর্গঠন এবং প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলাটি ফিরিয়ে